1 3 Set

চর্যাগীতির ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বে বৌদ্ধধর্মের যে প্রভাব দেখি লক্ষ্য করা যায় তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

চর্যাগীতি বৌদ্ধ সহজ সাধকদের গান, চর্যাপদে প্রকাশিত ধর্মমত সহজিয়া, বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মের আচরণে ও তার মূলভিত্তির উপর সহজিয়া সাধনার প্রসূত তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিই এখানে বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর ধর্ম-দর্শনের মূলভিত্তি কয়েকটি সূত্র নিয়ে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নীতিগত মতভেদ দেখা যায়। এরপর এই মতভেদ দূরকরার জন্য অনেকটি ধর্মসংঘ আবির্ভূত হয়। কিন্তু মতভেদের নিষ্পত্তি হলো না, এবং এই ভাবে দেশের সম্প্রদায় এবং প্রতিবাদীসম্প্রদায় দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। হীনযানরা মহাযান নামে পরিচিত হয়, হীনযানিরা বুদ্ধত্ব লাভের দুরাশা পোষণ করতেন না, বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে, ধর্মের পথে তারা মুক্তি লাভ করবে তপর হতেন, মহাযানীরা পরোপকারের মধ্যদিয়ে আত্মোৎসর্গের মধ্যদিয়ে মহাকরুণাবশত এবং তারচিত্তের দিয়ে বুদ্ধত্ব লাভকে আদর্শ মনে করতেন, এবং সেই বুদ্ধত্ব বিশ্বের কল্যাণের জন্য লাভ করতেন, এছাড়াও প্রতিটি জীবনের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধত্বের সম্ভাবনা বর্তমান এবং শূন্যতাও করুণার অভিন্নতায় প্রতিষ্ঠিত বোধিচিত্ত লাভের মধ্যদিয়ে বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভ হয়, তার ভিতর দিয়ে প্রত্যেকে ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। মহাযানের শূন্যতা স্বরূপের ভাব বলতে তাঁরা বুঝতেন যে রাগাদিজ দোষ বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বা স্বরূপ নেই। প্রত্যেকটি বস্তুই তার বর্তমান স্বরূপের জন্য অন্যান্যের স্বরূপের উপর নির্ভরশীল, কারণেই তাদের অস্তিত্ব নেই এই ভাবই শূন্যতা ভাব, আর পরোপকার এবং তার মধ্যদিয়ে রাগাদি ~~মুক্তি~~ সকলের মুক্তির জন্য চেষ্টাই হল করুণা, এই শূন্যতা ও করুণা যখন অভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই বোধিচিত্ত জাগে, একেই বলে বোধিসত্ত্বাবস্থা, আর এরমধ্যদিয়েই ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ হয়।

বুদ্ধ দেব পাল - ২৪ (নির্বাচিত চর্যাপদ)

মহাযানীদের আরও একটুকু বৈশিষ্ট্য হিসাবে বুদ্ধের পরিকল্পনা, বুদ্ধগণ পারমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন তখন (মিথুন ব্রহ্মের মতই) ধর্মকায়ে বিরাজ করেন, আর বোধিসত্ত্বদের কাছে যখন ধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত করেন, তখন সম্ভোগকায়ে করেন, আর সাধারণের জন্য যখন সূত্রাদি দান করেন তখন তিনি নির্মাণ কায়ে বিরাজ করেন, যেহেতু মহাযানীরা জীবের বুদ্ধত্ব কামনা করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবের মুক্তির জন্য পরোপকার, আত্মোৎসর্গ ও মৈত্রী, করুণার অনুশীলন করেছিলেন সেহেতু তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে, আর সেই সূত্রেই এই বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই তান্ত্রিকতা কখন কার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে পণ্ডিতেরা বলেন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে মন্ত্র টোনাদের প্রবেশ ঘটে সেই টোনাদেই তন্ত্র ধারা বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট হয়। এবং সেই ধারা থেকে মন্ত্রমুদ্রা যৌন যৌগিক সাধন পদ্ধতি মহাযানী বৌদ্ধধর্মে যুক্ত হয়। ক্রমে ধর্ম ~~পদ্ধতি~~ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়ে, তখন এর নাম হয় বজ্রযান। বজ্রযান

চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র, অনুত্তরতন্ত্র ইত্যাদি নানা শাখায় বিভক্ত হয়। কেউ কেউ একে ব্রজযান, কালচক্রযান ও সহজযান এই পৃথক নামাঙ্কিত করেছেন, তবে এরা কেউই ভিন্ন সম্প্রদায় নয়, তন্ত্রযানেরই সামান্য পৃথক ভিন্ন ~~[illegible]~~ মতবাদ।

যেহেতু চর্যাপদে বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদের প্রকাশ ঘটেছে, সেই হেতু তন্ত্রের মূলবক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে বলা যেতে পারে। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ ইনস্ট্রুমেন্ট, সত্যলাভের কার্যকারী পন্থা নির্দেশই তন্ত্রের লক্ষ্য। তন্ত্রের মতে পরমার্থের দুই রূপ — নিবৃত্তি রূপ- পুরুষ বা শিব, আর প্রবৃত্তিরূপা প্রকৃতি বা শক্তি। পরমার্থসত্য অদ্বয় স্বরূপে, শিব-শক্তির মিলিত অবস্থা। এই মিলিত অবস্থাই বীরের কাম্য। সংসার প্রকৃতি স্বরূপ শক্তির প্রভাবে পরিবর্তনের পথে চলেছে। তাকে প্রত্যাবৃত্ত করে নিবৃত্তিরূপে চালিত করা এবং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অদ্বয় মিলন ঘটালেই মুক্তিকামী বীরের লাভ। তন্ত্র মতে এই দেহই সকলসত্যের আধার। এখানেই আছে চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, নদ-নদী, শিব-শক্তি। দেহযন্ত্রের ভেতরে শিব-শক্তির মিলন ঘটাতে হবে, শিবশক্তি মেরুপর্বতে অর্থাৎ মস্তিষ্কে মূলাধারে কুণ্ডলিনীরূপে নিদ্রিত, তাকে জাগাতে হবে, নিরুদ্ধ করতে হবে ও আজ্ঞা এই চক্রকে ভেদ করে মেরুপর্বতের অর্ধোর্ধ্বে সহস্রারে ইন্দ্রস্বরূপ বিরাজিত শিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে। এরজন্য প্রাণায়াম করা দরকার। আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি নাড়ী আছে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। দেহমধ্যস্থিত প্রাণবায়ু অধমপথে সুষুম্না পথে চালিত করে সহস্রারে প্রেরণ করতে পারলে অদ্বয়সত্য লাভ হয়, এই হল তন্ত্রের মত।

মহাযান ধর্মতন্ত্রের সংসর্গে আসার পর নানাপরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়। মহাযানীদের মতে শূন্যতাই করুণা, তন্ত্রে ~~[illegible]~~ উপাসনার মূলকথা। এই শূন্যতাই করুণারূপে প্রজ্ঞা ও উপায়ে প্রকৃতি ও পুরুষে পরিণত হল, তবে তান্ত্রিকদের ~~[illegible]~~ সাথে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারণার একটা পার্থক্য রয়ে গেল। তান্ত্রিক ধারণায় নারীই সক্রিয় শক্তি, আর পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধারণায় পুরুষ ও উপায়ই সক্রিয়, অন্যদিকে প্রজ্ঞা বা প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। এই প্রজ্ঞা আর উপায়ের মিলিত অবস্থাই বোধিচিত্ত।

তান্ত্রিক আচার বৌদ্ধতন্ত্রে স্বীকৃত হওয়ায়, প্রজ্ঞা ও উপায়রূপে ইড়া ও পিঙ্গলার সাথে অভিন্ন হয়ে যম, নিয়ম, রবি-শশী, চন্দ্র-সূর্য, লললা রসনা ইত্যাদি নানা নামে উল্লেখিত হয়। সুষুম্না অন্তর্ভিত রূপে চিহ্নিত হয়। তবে ষট্‌চক্রের মধ্যে ধর্মচক্র, সম্ভোগচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে মহাসুখ থেকে চ্যুত হওয়ার কথা বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হতে থাকে, তন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে অদ্বয়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা তাকে বলা হয়েছে, শূন্যতা। তন্ত্রেই ~~[illegible]~~ অদ্বয় অবস্থা মহাসুখময়, আর বৌদ্ধধর্মে কথিত নির্বাণও একই হিসাবে মহাসুখময় অনুভূতি, বুদ্ধদেব দুঃখের হাত থেকে মুক্তি খোঁজছিলেন, সেইজন্য তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করেছিলেন এবং পরে বুঝেছিলেন মধ্যপথই আসল পন্থা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা বিলাসসম্ভোগময়, অর্থাৎ মাঝের অনুশীলনেই মানুষ দুঃখের স্রোতখেকে মুক্ত বা ছিন্ন স্রোত হতে পারে, একেই বলে নির্বাণ, এই নির্বাণই হল মহাসুখ।

যাই হোক তন্ত্র প্রভাবিত মহাযানী বৌদ্ধধর্মের স্রোতে উদ্ভূত সহজ পন্থই ছিল চর্যাগীতি-কারদের অবলম্বনীয়। মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনায় আদিতে অর্থের দুই ধারা চিরদিন বিরাজিত ছিল, যৌগিক সাধনপদ্ধতি ছিল আর্যের ধর্ম সমাজ। বেদাচার প্রতিষ্ঠাকী ও জাতিভেদ বিরোধী দেহ ভিত্তিক যোগসাধন পদ্ধতিই সহজ সাধনার ভিত্তি রচনা করেছিল, বৌদ্ধ সহজিয়াদের দৃষ্টি অধীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, জাতিনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব, তারা বিশ্বাস করতেন পরমসত্য লাভ পুস্তকপাঠ চর্চার মাধ্যমে হবেনা, সহজতত্ত্ব দীক্ষা ও যোগাভ্যাসের ভিতর দিয়েই পরম সত্য অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আসলেই যোগাভ্যাস সহজ কাজ কারণ কারি সংযম সাধুদের পক্ষে অস্বাভাবিক। আর এই যোগের মধ্যদিয়েই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পাশে শান্তি হয়। এই বৌদ্ধ সহজিয়ারা আচার, অনুষ্ঠান, জপ ও তপস্যার ফলে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে ক্ষুণ্ণ করার অবদমনের মাধ্যমে রসাত্মক ও উদ্ধাটিত করার কথা বলেছেন। ৩৪ নং চর্যায় দেখি দারিক পা বলেছেন- মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা কিছুই হয়না, সহজসুখ লীলায় প্রবিষ্ট না হলে পরম নির্বাণ লাভ হয়না, বাড়, বাড় ~~[illegible]~~ চিত্ত যার সহজে প্রতিষ্ঠা হয়নি, সে সহজের কথা বুঝবে কিভাবে? ৪০ নং চর্যায় এই নির্দেশের অর্থ আমরা বুঝতে পারি, সহজিয়ারা পরমসত্যকে সহজ বলেছেন, ইনিই নির্বাণ, ইনিই তথাগত, ইনিই আবার বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা, ইনিই বুদ্ধ জন্তু, আবার শূন্যতাও করুণার নির্বিকার অবস্থা সহজসুখ, এই সহজ দেহকেন্দ্রিক সাধনায়, এই বিশ্বাসের বশেই দিব্য দেহ সাধনা, সহজ সাধনায় গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এই দেহসাধনার উপায় সদগুরু ~~[illegible]~~ ভিন্ন মানা যায়না, চর্যাতেও বলা হয়েছে- 'গুরু বোধে জাগ রে ভিআ মাআ' কিম্বা পুচ্ছহু চাহিঅ অনুত্তর স্বামী' (৫৬.৫৮)।

এই সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে দেহই সাধনভূমি। দেহের ষোলকলায় মধ্যে সাধনতত্ত্বে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব নাড়ীর, এই নাড়ীগুলি রক্ত, শুক্র, মল, মূত্র বাহিনী, যেমন মাটি, রস, বায়ু ও শব্দের বাহিকা, দেহের কোটিচিত্ত বহা চুরাশি নাড়ী ছাড়াও। রসে লক্ষ্মী চন্দ্র ও দক্ষিণে রসনা, সূর্য। মধ্যে অবধূতিকা, চন্দ্র-সূর্যের সমবাহিত্ব হেতু সূর্য বাহিনী ধারা শক্তির আধারদেশে তিন নাড়ী, ললনা, বায়ু মূত্র বাহিনী, দক্ষিণে শুক্র ও জীব বাহিনী এর যোগ অবধূতির মধ্যদেশে তিন নাড়ী, ললনা, বায়ু মূত্র বাহিনী, দক্ষিণে শুক্র ও জীব বাহিনী এর যোগ অবধূতির মধ্যদেশে। আর মধ্যমালী, মজ্জাবাহী এর যোগ লক্ষ্মীর মধ্যে। অবধূতি বামদিকে এই পাঁচ নাড়ী-সঙ্গে। আর মধ্যমালী, মজ্জাবাহী এর যোগ লক্ষ্মীর মধ্যে। অবধূতি বামদিকে এই পাঁচ নাড়ী-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এরা পঞ্চ স্কন্ধের প্রতীক। আর এই পঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চ-তথাগত- বিরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য।

চর্যাগীতিতে দৃষ্টকল্পিত দেহসাধনার নানাবিধ নানাভাবে কল্পিত হয়েছে। যেমন- বামদা নাড়ী লক্ষ্মীর কথা আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন চর্যায়- ঈশ্বর (১) চন্দ্র (৭) জালি (৭) গোরা (৮)। তবে ললনা-রসনা চর্যাগীতিতে নেই, আছে তার বৈকল্প, এই দুই নাড়ীকে যুক্ত ভাবে ঈশ্বর-চন্দ্র (১), চন্দ্র-সূর্য (৪, ১৪) জালিকালি (৭), সুরকলস (১৪), কমলাহিন (২৪, ২৫) এবং গোরক্ষ (৪৭) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অবধূতি চর্যাসাধকের পরম কাঙ্ক্ষিত মার্গ, সাধকের শিরোদেশে তিনি জোগী (১০, ১৪, ২৮) কখনও চারিণী (২০) কখনও কমলিনী (২৭), ইনি নিরামণি, সহজসুন্দরী আবার সতীও, অপরিশুদ্ধাও পরিশুদ্ধাভেদে অবধূতির দুই রূপ, অপরিশুদ্ধা অবধূতি শুণ্ডিনী (৩), বাক্তরে বলেছেন ডিমনী। আর পরিশুদ্ধ অবস্থায় ইনি ডুবি-মাতঙ্গী (২৪)। চর্যাগীতিতে পদ্মের নামের কথাও বলা হয়েছে। ১০ নং চর্যায় দেখানো- "একমো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী/ তেঁহি-চড়ি নাচঅ জোগী বাপুড়ী" এই চৌষট্টি

পাড়ুরী আসলে সন্নিমুখ। এখানে সংকৃত সংসার, চিত্তের বিশোধন হয়। এজন্যই বলে নির্মল-চন্দ্র, সন্তোষ চন্দ্রের স্বাবলম্বী। ১৮ নং চর্যায় কাহ্ন শেষীকে বলেছেন- "বিন্দুর রস লোভে তোর কণ্ঠ ন ফেলই," অর্থাৎ বিন্দুর লোভে কণ্ঠ থেকে পরিত্যাগ করেন না। আবার ২৮ নং চর্যায় দেখি, কায়, নৈরাত্মনিকে সর্ব ধারণ করেছে, ও সুখেরও কারণ হয়েছে।

চর্যায় আরও দেখানো তৃতীয় সূন্যের কথা বর্ণিত আছে। এই তৃতীয় সূন্য মহাসূন্য। বজ্রযানের মতে এই তৃতীয়টি হল সার্বিকার সূন্য। ৫০ নং পদের তৈলোক্যারি আসলে তৃতীয় মহাসূন্য সার্বিকার, চতুর্থ মহাসুখের কথা আছে নাব চর্যায়। ২৮ নং ধ্যান চর্যায় তা উঁচু উঁচু পর্বত চূড়া, ২ নং চর্যায় তা কায়ন নকামন্দ। আবার ৪ নং ধ্যান চর্যায় তা বিন্দুর।

চর্যাপদে সাধনা তার নানা পর্যায় আছে। সেই পর্যায় সুন্দি নানা যৌগীতিতে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্যায়টি প্রজ্ঞোপায়ের, কাহ্ন পা, তারই কথা বলা হয়েছে; ২৭ নং চর্যায় 'রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ', কাহ্ন পার মতে সব তত্ত্বই পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা। আসাদুল্লা তারতুল, অবাধি ব্যবসায় বর মনের। বিন্দিপা, আর সুই পার প্রথম চর্যাতেই বলেছেন- চঞ্চলচিত্তে কাম প্রতিষ্ঠ হচ্ছে। এই চঞ্চল চিত্ত তুমুক পাদের ভাষায় সুসী। এই চঞ্চল চিত্তকে বিশোধনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি চিত্ত তুমুক পাদের ভাষায় সুসী। এই চঞ্চল চিত্তকে বিশোধনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে কাহ্নপার ১২ নং ধ্যান পদে, যার ধোয়ার রূপকে। এই জ্ঞানচিত্তকে কোটিরূপে তা সজ্ঞা মার্গে প্রবেশের রূপকেশী হয়। বজ্রধর প্রজ্ঞোপায় চন্দ্রাকৃতি ভাবনা। ৪ নং চর্যায় সুন্দরী পার বলেছেন- 'বাহ সুখ বেনি পখালেঅ'- চন্দ্র স্পর্শের পক্ষ সহ ধ্যানকরে, সেইবস্তু প্রজ্ঞোপায় প্রাণায়াম, আর ২ নং চর্যায় লুইপা কুম্ভীর আসলে কুম্ভক সমাধি, হয় ভাষায় প্রজ্ঞোপায় বা ললনা-রসনা যোগ। কর্মেন্দ্রিয় বহির্মুখ চিত্ত, অন্তর্মুখী হয়, এই প্রক্রিয়াকে প্রতিমুখ বলে, মন যোগাই মন রূপকে বিশ্বা নৌকা নির্মাণের রূপকে এই চিত্ত কোটিরের ভাবনা হয়েছে। এই কোটির প্রক্রিয়ায় চন্দ্র, সূর্য, অগ্নিজ্বালা বা ললনা-রসনাকে যোগী কায়ের কুণ্ডল বা পায়ের নূপুর বলে পারেন, এই অবধূতি প্রবেশের পথে কাপালিক আবরণীয়, কপাল মার্গ অগ্নি আবরণ যা মন্ত্রতন্ত্র সূন্যতার প্রতীক। যোগী লম্বা, ধূপা ভাবের অতীত যেই সব সাধকেরা হতে হয়, বিঘ্নও নষ্ট। এই পদেই প্রকাশ দেখি- 'নিঘিন কাহ্ন কাপালি যোগী',

এ ভাব সহজ সাধনার আসে তৃতীয় স্তর, অবধূতি মার্গকে অতিক্রম করে, অবধূতিমার্গে নেগেটিভ দোষ আছে, তাকে প্রজ্ঞাপায়ের দ্বারা পালিত হোতে হয়, এই অবধূতি মার্গকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে হয়। ভুসুকপা বলে বলেছেন- 'আসুবরে ঘালি কোঞ্চবাস'- অর্থাৎ সাধনে অবধূতিপথে পাড়ি জমাতে হবে, অবধূতি মার্গেও চিত্ত ভ্রান্তি। এই চিত্তকে প্রকাশ-

-স্থানের দিকে চালিত হয়েছে, লৌকিক তত্ত্ব চর্যাগীতিতে লক্ষিত হয়েছে। যেমন ২৪ নং চর্যায় – 'সোনা রুপা মাহেরে বহই নাই / তুঁহি কুড়িলী মাতঙ্গী / পোইআ লীলে পার করেই।" – এ ধারণা চিত্তের পতনের জন্য দায়ী, লৌকিক হতে পারে, ভাবোদ্গম হতে পারে। তাই এই সাধনাকে নাম দিয়ে বলা হয় 'লয় সাধন চাহি মিলিমিলি সাঁঝা / নাঠ মিলিল মহাসুহ সাঁঝা।' আবার চিত্ত নিশ্চল হলে চণ্ডালী প্রজ্বলিত হয়, তারফলে পঞ্চতথাগত দগ্ধ হয়ে যায়, তখন সাধক রূপান্তরিত হয়ে 'হয়'। এই ভাবটি আছে ৪৭ ও ৪৯ নং চর্যায়। আসলে এই চণ্ডালী হল প্রজ্ঞা, যখন ইন্দ্রিয়-সাত্ত্ব-অহং বিনষ্ট হয়, তখনই সাধক ত্রিগুণাতীত নিরাকৃত অহং। এই হল বোধিচিত্ত। এইখানেই মহাসুখের প্রভাস্বর, জ্ঞানী প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিষ্ঠান চিত্ত, অনাদিকাল মুক্ত হয়ে প্রভাস্বর মানস সমুদ্রে প্রবেশ করে, এখানে কোন ক্রিয়া নেই, আছে শুধু অনুভূতি আর সমাধিস্থ-ভাব। অনুভূতিতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্ফুরিত হয়, চিত্ত তেমন হয়ও তো, শুধুই ভাব। চর্যাকার বলেছেন- 'তেইআ বাড়ীর পাশে জোইনী নাচী।' (৪৮ নং চর্যা)। তখন চিত্ত সমরসী হওয়ায় মহাসুখে বিলুপ্ত হয়, এই মহাসুখ বাক্যাতীত। এই মহাসুখের বর্ণনাই চর্যাগীতি, দোহাতে, এই মহাসুখ সহজ-বোধ, এবং স্বরূপত: 'অনাদি বর্ণনেই চিত্তিনেই, দশনেই, এই মহাসুখ সহজ-বোধের কোনো মধ্যে সুন্দর পরিচয়নম্ নাহি' (২৪ নং চর্যা)। এই মহাসুখের সহজ-বোধের কোনো মধ্যে সুন্দর পরিচয় নাই। এ আসলে স্বচ্ছ আনন্দ।

(আমরা বুঝি চর্যাকাররা মহাসুখেরই সাধক, আর সেই সাধনায়, দেহসাধনাই প্রধান উপায়। আর এই দেহ সাধনা একান্তভাবে গুরুসাপেক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিকতা তন্ত্রের মিশ্রণ আর অত্যাচার দোষের সাক্ষ্যে নানা পরিবর্তনের পথেই সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়, শূন্যতাও ক্রমশ পরিবেশনার তান্ত্রিকতার পথে পরিবর্তিত হয়ে চর্যাকারদের সাধনতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্বের রূপান্তরিত পরিণাম লাভ করেছিল।)